কে বাঁচায়, কে বাঁচে

মা নি ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল– অনাহারে মৃত্যু। এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায় অফিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোটো ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে নিজের ছোটো কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে । দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যত কিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগরে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

Scanned with CamScanner

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দুজনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু'বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দু'টি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালো মানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোনো কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল, বড়ো একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

কী হল হে তোমার? নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করল।

'মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!' আনমনে অর্ধ-ভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হলো, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে এক সঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির থলিটিতে। ফুটপাথের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ? না খেয়ে মরা কী ও কেমন? কত কষ্ট হয় না খেয়ে মরতে, কী রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি না মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি—ভয়ংকর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।— 'ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনে-শুনেও এতকাল চার বেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে আরও এদিকে ভেবে পাই না কী করে সময় কাটাবে। ধিক্। শত ধিক্ আমাকে।'

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছল ছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অন্নের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি জন্মাবে কীসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি

Scanned with CamScanner

করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালোভাবে সদ্‌গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুতাশ করা মন্তব্য করা হয়েছে।

কদিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মানি-অর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটে সাহায্যই এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কিনা। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি।

'একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।' মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।

—'টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমি কেন?'

'আমি পারব না।'

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

'সমস্ত মাইনেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তোর ন'জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।'

'তা হোক। আমায় কিছু একটা করতে হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মা'র এক বেলার ভাত বিলিয়ে দি।'

নিখিল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায় মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থম থম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

'টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনেরো কুড়ি টিকতে পারবে।'

মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল।— 'আমি কী করব? কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না খেয়ে।'

নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো না কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আরেকজনকে খাওয়ানো।

Scanned with CamScanner

এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোনো কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল,– 'ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটে ছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড়ো পাপ।

'ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।'

'কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হতো? অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।'

'তুই পাগল নিখিল। বদ্ধ পাগল।' বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, এক সময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদ্দি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনি। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে। বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলে-বুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে–খানিক পরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদ কাঁদ মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।

নিখিলকে বার বার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতরে অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

Scanned with CamScanner

নিখিল বলে, 'আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।'

টুনুর মা বলে, 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'

'ঘুরতেন?'

'নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা। আমাকে দু'তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, 'আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না?' এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।'

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়—মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোটো একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি । খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!'

Scanned with CamScanner